(৪৫) মীরাবাই

মীরাবাঈ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্ত্তার নূতন শিক্ষাধারা অনুসারে বিদ্যালয়সমূহের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর
উপপাঠ্যরূপে লিখিত

আর্য্যলক্ষ্মী-সিরিজ—২নং গ্রন্থ

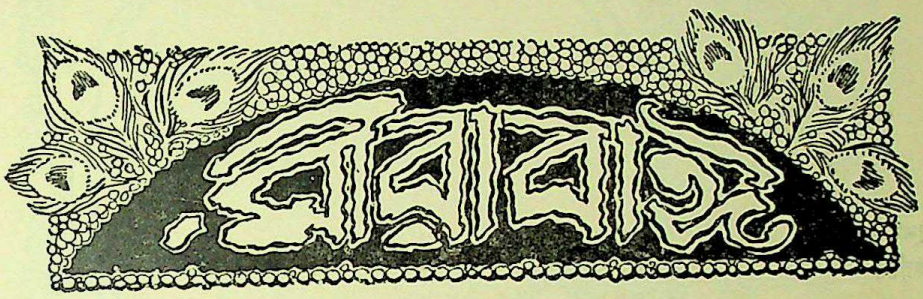

কৃষ্ণকুমারী, রাজ্যশ্রী, রাণী ভবানী, পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী,
গার্গী প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী

শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্তজায়া

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশক—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
কার্ত্তিক
১৩৬১

মুদ্রাকর—
এস, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
ছয় আনা

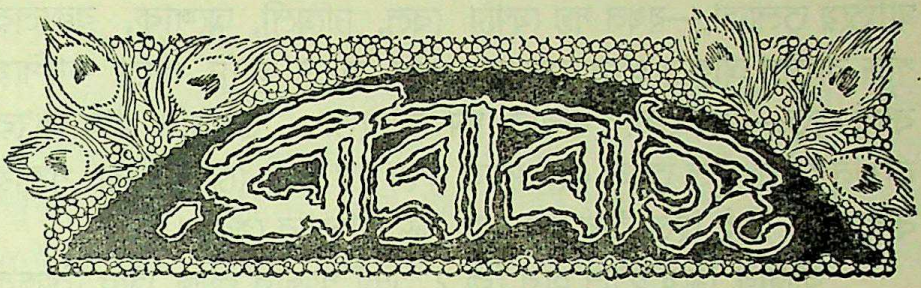

এক

রাজপুতানায় মাড়বাড় রাজ্য। তার মধ্যে মেড়তা হলো একটা ছোট জায়গীর। সেই মেড়তার যাঁরা ভূস্বামী, তাঁরা মাড়বাড়ের রাণারই আত্মীয়।

মাড়বাড়ের রাণা রাও যুধাজীর পৌত্র রতনসিং হলেন তখন মেড়তার শাসক। তাঁরই ঘরে জন্মগ্রহণ করেন মীরাবাঈ।

ঘর আলো-করা রূপ মেয়ের, যেন একতাল চাঁদের আলো। রাজার মেয়ে,—আদর সোহাগ অফুরন্ত।

ছোট্ট কচি মেয়েরা ছোট বেলায় খেলা নিয়েই দিন কাটিয়ে দেয়। পুতুল খেলাটাই তারা সব চাইতে ভালবাসে। পুতুল নিয়ে তাদের খেলার রকমারির অন্ত নেই, পুতুল খেলা পেলে তারা আর অন্য খেলা বড় একটা খেলতে চায় না। কিন্তু মীরা সে ধাঁচের মেয়ে ছিলেন না। তাঁর মন মোটেই পুতুল খেলায় বসত না। পূজা-পার্ব্বণ খেলাই তিনি পছন্দ করতেন বেশী।

ভোরে যখন পূব আকাশে ফাগ ছড়িয়ে দিত, গাছের ঝোপের

জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে ব'সে পাখীরা তাদের মধুর সুরে জগৎ মাতিয়ে তুলতো,—যখন সদ্য ফোটা বেল, চামেলী, অশোক, বকুলের গন্ধে বাতাস আকুল হ'য়ে ঝুর ঝুর শব্দ তু'লে কচি পাতা কাঁপিয়ে ব'য়ে যেত,—সেই ভোরে মীরার ঘুম ভাঙ্গতো। তখ্খুনি স্নান ক'রে বাগান থেকে ফুল তু'লে এনে চন্দন ঘ'ষে ধূপ ধুনো জ্বেলে মীরা পূজায় বসতেন। এই ছিল তাঁর সব চেয়ে বড় আদরের খেলা।

রাজার মেয়ে হ'লে হবে কি? এই পূজোর কাজ তাঁর নিজের হাতেই সব টুকুন করা চাই; ঝি চাকর বা অন্য কেউ তা' ক'রে দিলে তাঁর মন উঠবে না।

অত টুকুন এক ফোঁটা মেয়ে, মন্ত্র তন্ত্র জানেন না, তবু তাঁর পূজা করা চাই। বাবা, মা ও পুরুত ঠাকুর যখন পূজায় বসেন মীরা তখন এসে চুপটী ক'রে সেখানে ব'সে থাকেন, আর এক মনে চেয়ে দেখেন কি ক'রে তাঁরা পূজা করেন।

ছোট বেলা থেকেই মীরার পূজা-পার্ব্বণে এমন ভক্তি! এসব কেউ তাঁকে শিখিয়ে দেয়নি। নিজের খেয়ালেই তিনি এসব আরম্ভ ক'রে ছিলেন।

সেই ছোট্ট কচি এক ফোঁটা মেয়ে। পূজা-পার্ব্বণে কি ভক্তি তাঁর। মা-বাপ মেয়ের ভক্তি দেখে মনে ভারী খুসী হতেন, আর হাত জোড় ক'রে ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাতেন,—হে ভগবান্, চিরদিন যেন মেয়ের এমন ধারা ধর্ম্মে মতি থাকে।

ঈশ্বর যে তাঁদের এ প্রার্থনা পূরোপূরি শুনেছিলেন, তা'তে সন্দেহ নেই।

দুই

বৈশাখ মাস।

আকাশ জোছনার হাসিতে ভেসে গেছে, সে হাসির ঝর্ণা যেন আকাশ ছাপিয়ে পৃথিবীর বুকে এসে ঝাঁপিয়ে প'ড়্ছে। চাঁদ নীল সাগরের বুকে জোছনার পাল তুলে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, নীল সাগরের ঢেউএর মতন খণ্ড খণ্ড সাদা সাদা মেঘ আকাশের গায়ে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, তারাগুলো হীরের আলোর মত মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছে। ফুলের গন্ধ মাখানো ফুরফুরে হাওয়া। সেদিন বড় জোর একটা বিয়ের তারিখ। শানাই-এর মিঠে সুর চারিদিক থেকে বাতাসে ভেসে আসছে।

মীরাবাঈ বাড়ীর ছাতে উঠে শানাই-এর মিষ্টি সুর শুনতে শুনতে জোছনাভরা আকাশের দিকে তন্ময় হ'য়ে চেয়ে আছেন,—ভারী মধুর লাগছে তাঁর জোছনা-ভরা আকাশ, মাঠ, গাছপালা, বাড়ীঘর। মাঝে মাঝে এক একটা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে—চোখ গেল, বউ কথা কও,—কু-উ-উ-উ।

মীরা ব'সে ভাবছিলেন, এমন সুন্দর জোছনা যিনি সৃষ্টি করেছেন, না জানি তিনি কত সুন্দর!

বাড়ীর সুমুখ দিয়েই বড় রাস্তা চ'লে গেছে। সেই পথ দিয়ে আলো জ্বেলে বাজনা বাজিয়ে একদল বরযাত্রী যাচ্ছিল। বর ঘোড়ায় চেপে। তার সুন্দর পোষাক মিছিলের আলোয় ঝল্‌মল্ করছিলো।

পাঁচ বছরের মেয়ে মীরা বাবার কোলে উঠে মিছিল দেখতে এলেন। আলো, বাজনা, লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া দেখে তিনি অবাক্ হ'য়ে গেলেন। মীরা জিজ্ঞেস করলেন, ও কি যাচ্ছে বাবা?

ঘোড়ায় চেপে সুন্দর ঝলমলে পোষাক প'রে ঐযে বর যাচ্ছে মা! তোমারো একদিন এমনি সুন্দর টুক্‌টুকে বর আসবে, কত আলো জ্বলবে, কত বাজনা বাজবে, কত হাতী-ঘোড়া, লোকজন আসবে, কত ঘটা হবে;—ব' লে বা বা মেয়ের মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া আঙুরের থোকার মত কালো চুলের রাশ সরিয়ে দিয়ে সোহাগ ক'রে একটা চুমো দিলেন।

মেয়ে কিন্তু তখন থেকেই আব্দার ধ'রে বসলেন, তখ্‌খুনি তাঁকে টুক্‌টুকে বর এনে দিতে হবে।

মহা বিপদ! বর তৎক্ষণাৎ একটা চাই,—না এনে দিলে কিছুতেই নিস্তার নাই।

বাবা-মা তাঁকে কত বোঝালেন, এই কচি বয়সে কি বর আসে? বড় হ'লে বর আসবে। মেয়ে কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানছেন না।

মীরার মুখে সেই এক কথা, সব মেয়েরই যদি বর থাকে, আমার বর কোথায়?

বাবা তাকে বুঝিয়ে বলেন, তোমার যে বর হবে, সে এখন তোমারই মতন ছোট, গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়ছে, যখন বড় হবে, তখন সে এমনি লোকজন নিয়ে বাজনা বাজিয়ে তোমার কাছে আসবে!

মীরা কোন কথা শোনেন না, তাঁর বরকে তিনি এখুনি দেখবেন! সে যেখানে থাক্, যেমন ভাবে থাক্, সে এখুনি তাকে দেখবে।

মীরার বাবা মস্ত বড় বৈষ্ণব-ভক্ত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

শ্রীকৃষ্ণের ছোট একটা পাথরের সুন্দর মূর্ত্তি এনে মীরার হাতে দিয়ে বাবা বল্লেন,—এই নাও মা গিরিধারী কৃষ্ণ, এই তোমার বর।

এঁকে ভক্তি ক'রে পূজো ক'রো, ফুল দিয়ে সাজিও, ভাল ভাল কাপড়-চোপড় পরিও, যত্ন ক'রে কাছে বসে খেতে দিও ; বর তা' হ'লে ভারী খুসী হ'য়ে তোমায়ও ভালবাসবে।

খুকী মীরা কাল কুচ্‌কুচে খোকা বরটী পেয়ে ভারী খুসী হ'লেন।

বাবার কথামত মীরা তাঁর বরটীর উপর বেশ ক'রে মন দিলেন। ভাল ভাল ফুল তুলে তাঁর পূজো, ভাল ভাল খাবার খাওয়ানো, ভাল ভাল সাজ পোষাক পরানো, দিব্বি বিছানায় শুইয়ে পাখার হাওয়ায় ঘুম পাড়ানো, বরের সঙ্গে ব'সে সুখ-দুঃখের কথা কওয়া,···এই সব কাজেই মীরার এখন সময় কাটতে লাগলো।

এই রকম ক'রে ছোট্ট বেলা থেকেই মীরার মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একটা ভক্তি ও ভালবাসা জন্মেছিল। শ্রীকৃষ্ণের পূজাকেই তিনি জীবনের সব চেয়ে সেরা ধর্ম্ম বলে মনে করতে শিখেছিলেন।

জীবনের প্রথম চেতনার দিন থেকে মীরা সেই নব-কিশোর শ্যামল-তনু গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁর একমাত্র পতি বলে জানতেন। বাড়ীর সকলে মনে করতো মীরা বুঝি পুতুল নিয়ে খেলা করছে। করুক। আর কোন বায়না করে না, কোন আবদার করে না, রাতদিন সেই পুতুল নিয়ে আছে, মা-বাপ নিশ্চিন্ত। কিন্তু বালিকা মীরার কাছে সেটা আদৌ খেলা ছিল না। সেই পুতুল তাঁর কাছে পুতুল ছিল না। জীবন্ত মানুষের মতন সেই পুতুলকে ভালবাসতেন। সেই পুতুল যাঁর প্রতিমূর্ত্তি, এইভাবে তাঁর কাছে বালিকা মীরা সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করে ফেল্লেন। কৃষ্ণময় হয়ে গেল তাঁর জগৎ।

———

তিন

ক্রমশঃ মীরার বয়স বাড়তে লাগলো।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের ভক্তি এবং শরীরের সৌন্দর্য্যও বাড়তে লাগলো।

মীরার গলার সুর ছিল স্বাভাবিক ভাবেই ভারী মিষ্টি। তিনি আপনার মনে যখন পূজার মন্দিরে বসে, শ্রীকৃষ্ণের ভজন গান গাইতেন শু'নে মনে হ'তো স্বর্গ থেকে বুঝি গানের সুরগুলি ভেসে আস্‌ছে।

মীরার রূপগুণের কথা সমস্ত রাজপুতানায় ছড়িয়ে পড়লো। অনেক রাজা তাঁকে পুত্রবধূ ক'রে ঘরে নেবার লোভ সামলাতে পারলো না।

চিতোরের রাণা মুকুলদেব মীরার রূপ ও গুণের কথা শুনলেন। তাঁর ছেলের নাম কুম্ভ, কুম্ভই পরে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসবেন। কুম্ভের জন্য রাণা একটি সুন্দরী ও গুণবতী পাত্রী খুঁজছিলেন। মীরার কথা শুনে তিনি তাঁকে দেখবার জন্য বুড়ো মন্ত্রীকে মেড়তায় পাঠিয়ে দিলেন।

বুড়ো মন্ত্রী মীরার লক্ষ্মীর মত রূপ আর সরস্বতীর মত গুণের পরিচয় পেয়ে একেবারে সম্বন্ধ ঠিক ক'রে এবং আশীর্ব্বাদ শেষ ক'রে চিতোরে ফিরে এলেন।

যুবরাজ কুম্ভের বিয়ে। যথেষ্ট আয়োজনপত্র হ'লো। সমস্ত চিতোর যেন একেবারে আনন্দে মেতে উঠ্‌লো। শুভদিনে শুভলগ্নে কুম্ভের সঙ্গে মীরার বিয়ে হ'লো। কুম্ভ নববধূ নিয়ে ঘরে ফিরলেন।

কিছুদিন গেল। রাণা মুকুলদেবের মৃত্যু হ'লো; কুম্ভ চিতোরের রাণা হ'লেন, আর মীরা হ'লেন রাণী।

কুম্ভের সঙ্গে মীরার বিয়েতে সুখ হ'লো না কারো,—না মীরার, না কুম্ভের। কেন তাই বলছি।

কুম্ভেরা ছিলেন শাক্ত, অর্থাৎ মা ভগবতীর ভক্ত। আর মীরাবাঈ ছিলেন বৈষ্ণব, অর্থাৎ বিষ্ণুর ভক্ত। শাক্ত আর বৈষ্ণবে চিরকাল ধরে একটা ঝগড়া চ'লে আসছিল,—কেউ কারো ছায়া অবধি মাড়াতো না।

মীরা শ্বশুর-ঘরে এসেও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের পূজা আর কীর্ত্তন নিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন।

শাক্তের বাড়ীতে কৃষ্ণের পূজা!

কুম্ভের মা মীরাকে বল্লেন,—বৌমা, ও পূজা ত আমাদের বাড়ীতে চলবে না, আমরা যে শাক্ত, আর ও হচ্ছে বৈষ্ণবের পূজা। তোমায় ওসব ছেড়ে আমরা যে পূজা করি সেই করতে হবে।

মীরা ত শুনে অবাক্! বলে কি? এতদিন যে পূজা তিনি ক'রে এসেছেন, বাপ-মা যে পূজা করতে শিখিয়েছেন, আজ এখানে এসে তা' ছাড়তে হবে? যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রাণের ঠাকুর, তাঁকে আর তিনি পূজা করতে পাবেন না? মীরার মনে ভারী কষ্ট হ'লো।

মীরা তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চোখের জলে তাঁকে নাইয়ে দিনরাত কেঁদে কেঁদে বলেন,—ঠাকুর, ওঁরা আমায় তোমাকে ছাড়তে বলেন—কি নিষ্ঠুর ওঁরা! আমি কিন্তু তা' পারবো না, তুমিও কিন্তু ওঁদের মত নিষ্ঠুর হ'য়ো না ঠাকুর, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।

শ্রীকৃষ্ণের পূজা আর কীর্ত্তন তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারলেন না। যেমন করছিলেন, তেমনি করতে লাগলেন।

———

চার

কুম্ভের মা জেদ করতে লাগলেন, হয় শ্রীকৃষ্ণের পূজা ছাড়, তা' না হ'লে তোমায় এ বাড়ী ছাড়তে হবে।

মীরা এ কথায় প্রাণে বজ্র আঘাত পেলেন, এ বাড়ীর বধূ তিনি, এ রাজ্যের রাজরাণী তিনি, তাঁর স্থান হবে না এ বাড়ীতে? না হয় না হোক, তবু তিনি তাঁর প্রাণের ঠাকুরের পূজা ছাড়তে পারবেন না। সীতাকেও ত রাজ্য ছেড়ে বনবাসিনী হ'তে হয়েছিল, তিনি আর কোন্ ছার!

মীরা আঁচলে চোখ মুছে শাশুড়ীর পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রে বল্লেন,—আপনারা দয়া ক'রে চরণে ঠাঁই দিয়েছেন, আবার আপনারাই যদি তাড়িয়ে দেন তবে এ পৃথিবীতে আমার আর স্থান হবে কোথায়? ক্ষমা করুন আমায়, আপনাদের চরণ-ছাড়া করবেন না।

শাশুড়ী বল্লেন,—তোমায় ত আমাদের তাড়াবার ইচ্ছা নেই বৌমা, তবে তুমি শাক্তের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করছো, এতে কি ক'রে আর তোমায় বাড়ীতে স্থান দি? তুমি কৃষ্ণের পূজা ছেড়ে দাও, আমাদের ঘরের আদরের বৌ হ'য়ে ঘরেই থাকবে, তা' না হ'লে ত আর রাখতে পারি না বাছা!

মীরা তাঁর প্রাণের ঠাকুরটীকে বুকে ধ'রে বল্লেন,—ঠাকুর, তুমি আমায় যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাব, তোমায় বুকে নিয়ে সেখানেই আমি পরম সুখে থাকবো, তা' সে রাজবাড়ীতেই হোক, গাছ-তলাতেই হোক, আর ঘোর অরণ্যেই হোক।

রাজবাড়ীতে আর মীরার ঠাঁই হ'লো না। তাঁকে পৃথক্ বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হ'লো। এক বাড়ীতে মীরার সঙ্গে থাকলেও যেন এঁদের পাপ হবে,—জাত যাবে।

মায়ের আদেশে রাণা কুম্ভও মীরার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ ক'রে দিলেন। একা একটা নির্জ্জন বাড়ীতেই মীরাকে থাকতে হ'লো। শাশুড়ীর এই নিষ্ঠুরতায় মীরার প্রাণে যদিও খুব ব্যথা লাগলো,—তবু তিনি বুকের ব্যথা বুকে চেপে রেখে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও কীর্ত্তনেই দিন কাটিয়ে সমস্ত দুঃখ ভুলতে লাগলেন। তিনি যে রাজার মেয়ে রাজরাণী, এ কথা একেবারে ভুলে গেলেন।

সেই নির্জ্জন বাড়ীতে মনের আনন্দে তাঁর দিন কাটতে লাগলো। সেই নির্য্যাতন, সেই যন্ত্রণা নেই, বরঞ্চ তাঁর সুবিধাই হলো। সংসারের ভেতর থাকলে, সব সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, শ্রীকৃষ্ণকে ডাকবার সময় পাওয়া যায় না। এখানে এই একা বাড়ীতে কোন হাঙ্গামা, কোন ভাবনা নেই, সারাদিন সারা মনপ্রাণ দিয়ে তিনি শুধু ডেকে চলেন গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণকে। ডাকতে ডাকতে তিনি এমনি তন্ময় হয়ে যান যে, তাঁর মনে হয়, যেন তিনি বৃন্দাবনে বাস করছেন, তাঁর চারিদিকে ঘিরে কত সখী, বাতাসে কাণে আসে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর আওয়াজ, তিনি স্পষ্ট শুনতে পান বাঁশী বাজছে। সে-বাঁশী যেন তাঁকেই ডাকছে। আনন্দে, আবেশে ভরে উঠে মীরার মন। আকুল হয়ে কেঁদে ওঠেন, ওগো, দূরে থেকে আর বাঁশী বাজিও না, এসো কাছে, দেখা দাও, মীরার হৃদয় জুড়াও!

পাঁচ

এ সংসারে দুষ্ট বদমায়েস লোকের অভাব নাই। তারা কেবল লোকের মন্দ করতেই ভালবাসে। মীরাবাঈ-এর সম্বন্ধেও নানা কলঙ্কের কথা তারা রটিয়ে দিলে। রাণা কুম্ভের কানেও সে সব

কথা গেল। তিনি তা' সত্য ব'লেই বিশ্বাস করলেন, মীরার উপর তাঁর ভারী রাগ হ'লো।

একদিন দুপুর রাতে গুপ্তচর এসে সংবাদ দিল, তারা স্বকর্ণে শুনেছে, সেই নির্জ্জন বাড়ীতে মীরা কার সঙ্গে কথা কইছেন, হাসছেন, গান গাইছেন!

রাগে জ্ঞান হারিয়ে রাণা কুম্ভ তখখুনি তলোয়ার হাতে নিয়ে চুপি চুপি মীরাবাঈ-এর ঘরের দোর-গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি শুনতে পেলেন, মীরা সত্যি সত্যি কার সঙ্গে হাসছেন, কথা কইছেন, গান গাইছেন।

এক লাথি মেরে রাণা কুম্ভ খোলা তলোয়ার হাতে ঘরে ঢুকলেন।

শু'নে কুম্ভের পা থেকে মাথা অবধি রাগে জ্ব'লে উঠ্‌লো, তিনি নিঃসন্দেহ হলেন,—লোকে যা বল্‌ছে সত্যি ত তবে তাই।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। কুম্ভ এক লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে খোলা তলোয়ার হাতে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

কিন্তু কৈ! ঘরে ত কেউ নেই। কেবল মীরা আর তাঁর সেই গিরিধারী কৃষ্ণের মূর্ত্তিটী। ঘৃতের প্রদীপটী মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছে, ধূনোর ধোঁয়া উঠ্ছে, পুষ্পপাত্রে ফুল-চন্দন সাজানো রয়েছে, মীরা কৃষ্ণঠাকুরের মূর্ত্তির সুমুখে চোখ বুঁজে ব'সে আছেন।

মীরা এমন তন্ময় হ'য়ে ব'সে ঠাকুরের ধ্যান করছেন যে, দরজা ভাঙ্গা বা কুম্ভের ঘরে প্রবেশ,—তিনি এসব কিছুই জানতে পারেননি।

মীরার সেই শান্ত মূর্ত্তি দেখে রাণা কুম্ভ অবাক্ হয়ে গেলেন। যতবার তাঁর দিকে যেতে চেষ্টা করেন, যেতে আর পারেন না, যেন কি একটা অদৃশ্য শক্তি তাঁকে টেনে রাখে।

হঠাৎ রাণা কুম্ভের কাণে এলো, মীরাবাঈ কথা বলছেন। রাণা চমকে উঠলেন। কিন্তু বুঝলেন, মীরাবাই তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন না, তাঁকে মীরাবাঈ দেখতেই পাননি। কারণ তখনো তাঁর দুটী চোখ ধ্যানে বন্ধ।

মীরা বলে ওঠেন, ওগো নিষ্ঠুর, আমার সঙ্গে কেন এমন কর! না, এই তোমার অভ্যাস! কাঁদাতেই তুমি ভালবাস! তবে জেনে রেখ, এ নয়ন যদি কান্নায় পচেও যায়, তবুও তোমাকেই চাইবো!

কুম্ভ দেখেন মীরার দুচোখ দিয়ে দর দর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতে মীরা আবার বলেন, তোমার অসীম দয়া, তুমি তবু আমাকে দেখা দাও,—ক্ষণিকের জন্যে হলেও ; অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে কোলে তুলে নাও,…আমি যে চাই, তোমার সঙ্গে বাস করতে, চব্বিশ ঘণ্টা তুমি থাকবে আমার কাছে, আমি থাকবো তোমার

কাছে, চোখ চাইলেই তোমাকে দেখতে পাবো···তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই, কিছু নেই! কবে, কবে দেবে দেখা, ওগো চঞ্চল, কবে তুমি আমার প্রেমে পড়বে বাঁধা! তুমি যা চাও, আমি তাই দেব, আমার দেহ-তনু-মন সে তো তোমারি!

কুম্ভ পাথরের মত স্থির হ'য়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। মীরা হঠাৎ আপন মনে একটা কীর্ত্তন গেয়ে উঠলেন,—আবার কিছুক্ষণ চুপ, আবার কথা কইলেন,—আবার চুপ!—তারপর খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলেন!

কুম্ভ অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিছুই বুঝতে পারলেন না,—তবে কি মীরা পাগল হ'য়ে গেল?

কুম্ভ মীরাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কার সঙ্গে কথা কইছিলে তুমি এতক্ষণ?—কোথা সে?

এবার মীরার চমক ভাঙ্গলো,—তিনি চোখ চাইতেই দেখলেন, রাণা কুম্ভ দাঁড়িয়ে। তিনি কোনো কথা কইলেন না।

কুম্ভ আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—কে সে,—কোথায় সে? যার সঙ্গে এতক্ষণ তুমি কথা কইছিলে?

মীরা উত্তর করলেন, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে কথা কইছিলাম।

কুম্ভ আরও রেগে গেলেন, বল্লেন,—কে তোমার স্বামী? আমিই'ত তোমায় বিয়ে ক'রে নিয়ে এসেছি।

মীরাবাঈ তেমনি সহজ সরল ভাবে বল্লেন,—আমার এই বাইরের শরীরটার আপনি স্বামী হ'তে পারেন মহারাজ! কিন্তু আমার হৃদয়ের স্বামী যিনি, তিনি শুধু এই মেবারের রাজা নন, এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তিনি। গুণ তাঁর অশেষ, ক্ষমতা তাঁর অদ্ভুত। আমায় তিনি

বড় ভালবাসেন, আমার চোখে জল দেখলে তিনি আদর ক'রে মুছিয়ে দেন, প্রাণে যত বড় ব্যথাই পাই না কেন তাঁর মিষ্টি কথায় আমি সব ভুলে যাই। যখ্‌খুনি আমি তাঁকে ডাকি তখ্‌খুনি তিনি ছুটে এসে আমায় কোলে তুলে নেন, কি সুন্দর তিনি! বর্ষার নব মেঘের মত তাঁর রূপ, মাথায় ময়ূরপাখা, চরণে নূপুর, হাতে মোহন বাঁশী, মুখে হাসির ঝর্ণা, গলে বনফুলের মালা, পরনে পীতধড়া। আমার এই প্রাণ দিন-রাত সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে প'ড়ে আছে, তিনিই আমার স্বামী।

মীরার কথায় কুম্ভের ভুল ভেঙ্গে গেল। লোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে কত বড় একটা অন্যায় কাজ তিনি করেছেন, সেজন্য তাঁর বড্ড অনুতাপ হ'তে লাগলো। মীরার ভক্তি দেখে তাঁরও প্রাণ গ'লে গেল। তিনি মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। অনুতপ্ত হয়ে কুম্ভ বলেন, মীরা, আমাকে তুমি ক্ষমা কর, তোমাকে ভুল বুঝে অনেক কষ্ট দিয়েছি!

মীরা হেসে বলেন, আপনি বৃথা অনুতাপ করছেন, আমি তো কোন কষ্ট পাইনি! এই নির্জ্জন বাড়ীতে আমাকে একলা রেখে বরঞ্চ আমার সাধনার সুবিধে করে দিয়েছেন!

কাতরভাবে কুম্ভ বলেন, মীরা, প্রাসাদে ফিরে চল···আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে কেউ আর কিছু বলবে না!

মীরা বলেন, প্রভু, যেখানে আমার গিরিধারী থাকেন, সেইখানেই আমার ঘর, সেইখানেই আমার প্রাসাদ। তাই মিনতি আমার, আমাকে আর প্রাসাদে যেতে বলবেন না!

রাণা কুম্ভ সেই বাড়ীতেই মীরার পূজা-আয়োজনের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। পূজা-অর্চ্চনা আর দীনদুঃখীদের সেবায় মীরার দিন কেটে যেতে লাগলো।

ছয়

একদিন মীরাবাঈ ব'সে তাঁর মিষ্টি গলায় কীর্ত্তন গাচ্ছিলেন। সে গানের সুর যেন এই পৃথিবী ছাপিয়ে কোন এক সুদূর অজানা দেশে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল!

গান থেমে গেল।

মীরাবাঈ দেখলেন, তাঁর সুমুখে একজন বৈষ্ণব সাধু দাঁড়িয়ে। গানের সুরে সাধু যেন তখনও তন্ময় হ'য়ে রয়েছেন!

কিছুক্ষণ পরে সেই সাধু তাঁর গলা থেকে একছড়া খুব দামী মুক্তার মালা খু'লে মীরার সুমুখে রেখে বল্‌লেন,—এই মালাছড়া আমি শ্রীকৃষ্ণকে দিলুম। আমি একজন ধনী সওদাগর ছিলুম, কয়েক বৎসর হ'লো সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছি। সন্ন্যাসীর এ মালায় আর কি দরকার? তাই আজ ঠাকুরকে উপহার দিলুম।

মীরা মালাছড়া নিয়ে ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলেন।—ভারী সুন্দর হ'লো দেখতে।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে চ'লে গেলেন।

এই সন্ন্যাসী আর কেউ ন'ন। স্বয়ং মোগলসম্রাট্ আকবর!

মীরাবাঈ-এর রূপ আর তাঁর গানের কথা শুনে সম্রাটের একবার তাঁকে দেখবার ইচ্ছা হ'য়েছিল। কিন্তু মীরাবাঈ মেবারের রাণা কুম্ভের স্ত্রী। মুসলমান সম্রাটের পক্ষে তাঁকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। তাই চতুর আকবর সন্ন্যাসীর বেশে গিয়ে তাঁর মনের ইচ্ছা মিটিয়ে এলেন।

একথা কিন্তু গোপন রইলো না।

চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়্‌ল, আকবর গোপনে মীরাবাঈ-এর

সঙ্গে দেখা কর'তে গিয়েছিলেন,—শুধু দেখাই নয়, তাঁর গান শুনে খুসী হ'য়ে একছড়া মুক্তার মালাও উপহার দিয়ে এসেছেন।

—সত্যি কথাটা চাপা প'ড়ে গেল। মিথ্যা কথাটা নানা রং-এ চারিদিকে রটতে লাগলো। যারা শুনলো, তারা সবাই ছি ছি করতে লাগলো।

রাণা কুম্ভ এ অপমান সহ্য করতে পারলেন না। তিনি স্থির করলেন, মীরাবাঈকে মেরে ফেলাই হচ্ছে সব চাইতে ভাল, তা' হ'লে আর ওসব কলঙ্কের কথা শুনতে হবে না।

তিনি মীরাবাঈ-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। গিয়ে দেখেন, সেই মুক্তার মালা কৃষ্ণঠাকুরের গলায় দুল্‌ছে। কুম্ভ জিজ্ঞেস করলেন, মীরা, তুমি এ মুক্তার মালা পেলে কোথায়?

মীরা বল্লেন,—আমি কোথায় পাব? ঠাকুরের পরতে ইচ্ছে গেছে, তাই তিনি জোগাড় ক'রে এনেছেন।

কুম্ভ রাগে জ্বলছিলেন। মীরার কথায় তাঁর রাগ দ্বিগুণ হ'য়ে উঠলো। তিনি একটা বিষের বাটী তাঁর সুমুখে ধ'রে বল্লেন,—মীরা, তোমার জন্য আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না,—তুমি না মরলে আমার শান্তি নাই। আজ তাই এই বিষ নিয়ে এসেছি, এক্ষুণি তোমায় এ বিষ খেতে হবে।

মীরা মুখে একটা কথাও বল্লেন না। বিষের বাটীটা হাসিমুখে তুলে নিয়ে প্রথমে কৃষ্ণঠাকুরকে নিবেদন করলেন, তারপর এক চুমুকে সবটুকু খেয়ে ফেল্লেন। মীরার মনে হ'লো যেন তিনি অমৃত খেলেন।

রাণা কুম্ভ অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, অমন ভীষণ বিষ, যার

এক ফোঁটা খেয়ে মানুষ তৎক্ষণাৎ ঢ'লে প'ড়ে যায়, মীরা তার অতখানি খেয়েও চুপ চাপ ব'সে আছেন!

পরদিন দরবার বসলো। কুম্ভ রাজসভায় ব'সেই হুকুম দিলেন,—মীরাবাঈ ডাইনী, মেবার রাজ্যে আর তাঁর স্থান হবে না। আজই রাজ্য থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

সভা স্তব্ধ, লোক স্তব্ধ হ'য়ে রাণার এ কঠোর আদেশ শুনলো।

রাজার হুকুম, কে তার উপর কথা কয়? মীরাকে সত্যি মেবার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'লো। তিনি হাসিমুখে কৃষ্ণঠাকুরকে বুকে নিয়ে মেবার ছেড়ে চলে গেলেন।

বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের প্রধান তীর্থস্থান। মীরা সেখানে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁর মুখে ধর্ম্মের কথা শুনে দলে দলে বহু লোক এসে তাঁর শিষ্য হ'লো। ভারতবর্ষের যেখানে যত বৈষ্ণবতীর্থ আছে মীরা তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেই সব তীর্থ বেড়িয়ে এলেন।

কয়েক বছর বৃন্দাবনে কাটিয়ে, সমুদ্রের ধারে দ্বারকায় যেখানে শ্রীকৃষ্ণ শেষ জীবন কাটিয়ে ছিলেন, সেখানে গিয়ে মীরাবাঈ একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। নানা দূর দেশ থেকে বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী ও সাধু সেখানে তীর্থ করতে আসতে লাগলেন। দেখতে দেখতে মীরাবাঈ-এর সেই মন্দির বৈষ্ণবদের কাছে একটা বড় তীর্থ হ'য়ে পড়লো।

সাত

ভাদ্রমাস। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথি।

মীরাবাঈ-এর নূতন মন্দিরে আজ মহোৎসব। বহু দূরদেশ থেকে দলে দলে লোক এই উৎসব দেখবার জন্য দ্বারকায় এসেছে। মীরার প্রাণে আজ আর আনন্দ ধরে না। তিনি চারদিক্ ঘুরে ঘুরে উৎসবে কোনরকম ত্রুটি না হয় তা' দেখছেন। তাঁর পায়ের ধুলো পাবার জন্য শত শত লোক হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ বা তাঁর পায়ের তলায় শুয়ে পড়ছে।

এমন সময় হাতী, ঘোড়া, নিশান বাদ্য-বাজনা নিয়ে এক প্রকাণ্ড মিছিল এসে সেই মন্দিরের দুয়ারে দাঁড়ালো। তারপর বারোজন প্রকাণ্ড পালোয়ান বেয়ারা একখানা রূপার পাল্কী ব'য়ে এনে মন্দিরের দুয়ারে নামালো। সবাই অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলো,—ব্যাপারখানা কি ?—কোন রাজা বোধহয় উৎসব দেখতে এসেছেন।

পাল্কীর ভেতর থেকে নামলেন রাণা কুম্ভ,—মীরাবাঈ-এর স্বামী।

কুম্ভ এতদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন, এতদিন অনর্থক লোকের কথায় ভুল বিশ্বাসে তিনি তাঁর স্ত্রীর উপর অমন অত্যাচার করেছেন। মীরাবাঈ-এর কোনো দোষ নাই, তিনি ধার্ম্মিক, পবিত্র।

এবার তিনি মীরাবাঈকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন।

তিনি মীরাকে বল্লেন,—মীরা, না বুঝে শুনে কুলোকের কথায় ভুলে তোমায় বড় কষ্ট দিয়েছি। আমায় ক্ষমা কর, চল, ঘরে ফিরে যাই।

মীরাও যেতে রাজী হ'লেন। তাঁর মুখে যেন আজ আর হাসি

ধরে না।—যারা তাঁকে একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারাই আজ আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে।

মীরা বেশ দিব্বি কাপড়-চোপড়, গহনা প'রে এসে স্বামীর পায়ের উপর প'ড়ে প্রণাম করলেন।

তারপর,—

কৃষ্ণঠাকুরের সঙ্গে দেখা না ক'রে ত যাওয়া চলে না।—তাই তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবার জন্য মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অনেকক্ষণ যায়,—

মীরা আর বেরোচ্ছেন না। কুম্ভ অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শেষে মন্দিরের দরজা ভেঙ্গে ফেলতে হুকুম দিলেন। রাজা হুকুম দিয়েছেন, আর কথা কি? দরজা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে পড়ে গেল। কুম্ভ মন্দিরের মধ্যে ঢুকে দেখেন, মীরা সেখানে নাই, কৃষ্ণঠাকুরটী সোণার সিংহাসনে ব'সে কেবল মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছেন।

রাণা কুম্ভ মীরাবাঈকে মন্দিরের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেন। কিন্তু পেলেন না।

মীরা তাঁর অন্তরের স্বামী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলে এক হ'য়ে গেছেন। এ পৃথিবীতে আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—শেষ—

শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত

ছেলেমেয়েদের উপহার দিবার মত কতকগুলি বই

জীবনীকথা

লৌহ মানব প্যাটেল ১৲
বিপ্লবী ষ্টালিন ১৲
সত্যাশ্রয়ী বাপুজী ২৲
রাষ্ট্রনেতা জওহরলাল ১৲

নাটক

সিপাহী বিদ্রোহ (ছেলেদের জন্য) ১৲
বুড়িবালামের তীরে ১৲
মাটীর ঘর (মেয়েদের নাটক) ।৶০
ঝাঁসির রাণী ।৶০

পূজাবার্ষিকী

বসুধারা ৪৲ ইন্দ্রধনু ৪৲

জ্ঞানের বই

অতীতের পৃথিবী ১।৹
বিজ্ঞানের যুগান্তর ৸০
বিজ্ঞান-জগৎ ৸০
বিজ্ঞানের মায়াজাল ১৲

ব্যায়াম বিষয়

ছোটদের খেলা ও ব্যায়াম ।৶০
বলীদের গল্প ১।৹

ভ্রমণ কথা

দুর্গমের বিভীষিকা ১৲
কম্যাণ্ডার কম্বুতর ১।৹
আকাশ গঙ্গা ১।৹

জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধীয়

পাতালপুরের দিগ্বিজয়ী ১৲
জীবজগতের আজব কথা ১।৹

অনুবাদ সিরিজ

কিং সলোমনস্ মাইনস্ ১।৹
থ্রি মাসকেটিয়ার্স ১।৹
দি লাষ্ট ডেজ অফ পম্পেঈ ১।৹
ক্ল্যুয়োভাদিস্ ১।৹
আঙ্কল টমস্ কেবিন ১।৹
ছায়া ও কায়া ১৲
বাসুকীর অভিশাপ ১৲
কৃষ্ণার অভিযান ১।৹
বনে জঙ্গলে কৃষ্ণা ১।৹
নিঝুম রাতের কান্না ১৲
বাঘের দেশে ১৲
ঘোরপ্যাঁচ ১৲
সুন্দরবনের গুপ্তধন ১।৹
বাঘরাজ্যের অভিযান ২৲
আলেয়ার আলো ১৲
অন্ধকূপের বন্দী ১৲
কৃষ্ণার পরিচয় ১।৹
পেশোয়ারের বিভীষিকা ১৲

ছোটদের রমেশ দত্ত সিরিজ

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ১৲
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা ১৲
বঙ্গবিজেতা ১৲

ছোটদের বঙ্কিম ও দামোদর গ্রন্থাবলী

নবাবনন্দিনী ১৲
তিলোত্তমা ১৲
বিষবৃক্ষ ১৲
মৃন্ময়ী ১৲

পাঁচমিশালী

অনেক দিনের অনেক কথা ২৲
ছোটদের পদ্মাপুরাণ ২৲
রঙীন আকাশ ২৲
জন্মদিনের উপহার ২৲

ভূতুড়ে কাণ্ড

অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ২৲
ঠাকুরমার ঝুলি ৩৲
নরখাদক ১৲

দেব-সাহিত্য কুটীর ৩৩ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা